Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 149 - 163
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে গৌণ চরিত্রের ভূমিকা ও জীবন-ভাবনা

ড. মোঃ মিসবাহুল ইসলাম
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর, নদীয়া
Email ID: misbahul89@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Gouno charitrer bhumika, Jiban-Bhabana, Probhab.

Abstract
Literature is a reflection of society and culture. And so Manik Banerjee wanted to capture the full picture of life even in this youngest form of literature, wanted to find the real, down-to-earth people, that is, the meaning of the whole human being. In Manik's stories, we get to know the innermost parts of the human mind, the complex mind. He presented the 'reptilian nature' that exists in the human mind to the reader through short stories. And he created various secondary characters to properly unfold all these events in the story. How these secondary characters have influenced his stories is explained through a discussion of a few stories.

Discussion

সাহিত্য হল সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিরূপ। আর তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের এই কনিষ্ঠতম সংরূপটিতেও ধরতে চাইলেন জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি, খুঁজতে চাইল বাস্তবের মাটি-ঘেঁষা-মানুষকে তথা 'গোটা মানুষের মানে।' মানিকের গল্পে তাই আমরা পাই মানব মনের আঁতের কথা, জটিল মনের পরিচয়। মানুষের মনে যে 'সরীসৃপ' সত্তা রয়েছে তা পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরলেন ছোটগল্পের মাধ্যমে। আর এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে যথাযথভাবে গল্পে পরিস্ফুটনের জন্য নির্মাণ করলেন নানান গৌণ চরিত্রের। তাঁর গল্পে এই গৌণ চরিত্রগুলি কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা কয়েকটি গল্প আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যখন বাংলার আকাশে শুধুই হতাশা, দুর্ভাবনা, ভয় এবং সানাইয়ের সুর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তেমনই এক সময়ে আশ্বিন ১৩৫৩ কথা-শিল্প (গল্প সংকলন) নামক পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্রান্ত গল্পটি প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩৫০ সালে খতিয়ান গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এই যুদ্ধকালীন সময়ের ছাপ গল্পটির পরতে পরতে লক্ষ করা যায়। গল্পটি মূলত দু'জন স্বপ্নসন্ধানী মানুষের; প্রতিমা-মহেশের। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিল জীবনে সানাইয়ের সুর বাজার। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালীন সময় কীভাবে তাদের জীবনের সুন্দরগুলোকে মলিন করে তুলেছে তার পরিচয় পাবো। আর এই মলিনতার ছাপ ধরেই সমাজের তিনটি শ্রেণির পরিচয়ও পেয়ে যাব। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ সচেতন শিল্পী। তাই তাঁর গল্পে সমাজভাবনার বিন্যাস থাকাটাই স্বাভাবিক। এই গল্পেও আমরা দেখব একদিকে রয়েছে ধনতান্ত্রিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ বা মালিক শ্রেণি যারা সময়ের চাহিদায় কিছু মানুষকে চাকরি দেয় এবং কার্যসম্পন্ন হলে তাদের একেবারে ছুটিও দেয়, যার শিকার হয়েছে - মহেশ, মাখন, বীরেন এবং মিনতির বর। অন্যদিকে রয়েছে একেবারে খেটে খাওয়া মানুষ অর্থাৎ আহ্লাদীর মতো কাজের ঝি-রা, যারা পেটের তাগিদে কোলের বাচ্চাকে লুকিয়ে রেখে কাজে যোগ দেয় এবং পরে কান্নারত শিশুকে মাটিতে এক কোণে ফেলে নির্লিপ্তভাবে কাজ করে –

> "ছেলেটা মেঝেতে পড়ে কাঁদে বলেও আহ্লাদী যেন অপরাধী হয়ে থাকে। অন্য ঝিদের তুলনায় সে তাই আশ্চর্যরকম নরম, ভালভাবে কাজ করতে উৎসুক।"[১]

শিশুর কান্নার জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকে। আসলে এই শ্রেণির মানুষরা সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষদের থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা রাখে না।

আবার প্রতিমাদের মতো সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা একদিকে যেমন মালিক শ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তেমনই আবার মালিকের কাজের প্রতি 'সম্মানজনক' দায়বদ্ধতা থাকে। আবার কীভাবে নিজের অজান্তেই নিজেরাই কখন এই মালিক শ্রেণির মতোই ব্যবহার করে বসে সমাজের একেবারে নীচু শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে। তাই আহ্লাদীর বাচ্চা কাঁদতে থাকলে–

> "প্রতিমা মাঝে মাঝে অতিষ্ট হয়ে বলে, একটু সামলে নাও ছেলেকে আগে।... গোড়ায় জানলে ওকে প্রতিমা রাখত না। প্রথম দুদিন বাচ্চাটাকে আহ্লাদী সঙ্গে আনেনি– কোথায় কার কাছে ফেলে এসেছিল কে জানে!"[২]

আসলে গল্পটি প্রতিমাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের Self Realization-এর গল্প। তাই গল্পের শেষে এই প্রতিমাকেই দেখব আহ্লাদীর ছেলের 'গা পোড়া জ্বর'-এর কথা শুনে–

> "কাজ করতে এলি কেন তুই? ধমক দিয়ে বলে প্রতিমা।"[৩]

আর এরপরে আহ্লাদি যা বলে তার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ের বিশ্রী রূপটি ধরা পড়ে পাঠকের সামনে–

> "না হলে তো মাইনে কাটবে। খাব কী? আহ্লাদী বলে দাঁতে দাঁত কামড়ে।"[৪]

এখানেই আহ্লাদী গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রতিমার জীবন-ভাবনার পরিবর্তন এনেছে। তবে গল্পে একা আহ্লাদী এই কাজটি করেনি। একই সঙ্গে উপস্থিত দুটি পরিবার যারা মূলত গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবেই বিবেচিত অর্থাৎ মিনতি, মাধব, সুধার স্বামী এদের চোখে দেখা পারিবারিক জীবনও প্রতিমার উপর প্রভাব ফেলেছে। শুধুমাত্র ক্ষণিকের উপস্থিতিতেই এই চরিত্রগুলো প্রধান চরিত্রের মানসিকতায়, ভাবনায়, নিম্ন শ্রেণির মানুষদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে। তাই যে প্রতিমা একসময় আহ্লাদীর বাচ্চার কান্নায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিল সেই প্রতিমাই বাচ্চার অসুস্থতার জন্য ছুটি নিতে বলেছে আহ্লাদীকে। আর এখানেই গৌণ চরিত্রগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাঁচ বছর পর কর্মক্ষেত্র থেকে মুকুলের বাড়ি ফেরা ও বাড়িতে আসার পর পরিবর্তমান জীবনের ছবিগুলো নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগন্তুক গল্পটি। গল্পটি ১৩৩৯ সালে কার্তিক সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে অতসীমামি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'আগন্তুক' গল্পটি একাধারে যেন চরিত্র চিত্রশালা। গল্পে মুকুল ছাড়া বাকি সব চরিত্রগুলোকেই আমরা গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। মুকুলের আগমনকে ঘিরে গল্পের প্রত্যেকটি গৌণ চরিত্রের কল্পনা ও ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করে থাকব। অতুল, বাসন্তী, মাসি, পটলি সকলেই মুকুলের আগমনকে কেন্দ্র করে তাদের ভাবনার জগৎ আবার ভাবনার সঙ্গে মুকুলের কর্মক্রিয়ার ছেদ ঘটায় তাদের মান, অভিমানও প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পটলির কথা–

> "পটলির আবার অভিমান হইয়াছে। দাদা আসিয়া খোকাকে দেখিবে। কোলে নিয়ে আদর করিবে, এ তাহার অনেক দিনের সাধ। এ সাধ মিটিতে দেরি হইবে না, খোকার ঘুম মিনিটে মিনিটে ভাঙে, কিন্তু দাদা যে কতদূর পর হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পটলির সাধের আর তেমন জোর রহিল না। বাড়ি পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে তার খোকাকে দেখিবার আগ্রহ নাই দাদার। এ তো সে দাদা নয়।"[৫]

এই সমস্ত গৌণ চরিত্রগুলি ছাড়াও গল্পে আর একটি গৌণ চরিত্রের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করব, সেটি হল মুকুলের স্ত্রী শশীমুখী মুকুলের আগমনকে কেন্দ্র করে একমাত্র শশীমুখীর কোনো কল্পনা বা অভিসারের কথা গল্পে প্রকাশিত হয়নি।

কিন্তু গল্পটির নামকরণের সার্থকতা দানে ও তৎকালীন নারী সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে শশীমুখী।

গল্পে শশীমুখীর প্রথম প্রবেশ যখন মুকুল বাড়ি এসে উপস্থিত হয়—

> "শশীমুখী রান্নাঘরে গিয়া লুকাইল।"[৬]

পুরো গল্প জুড়ে আমরা শশীমুখীর তেমন প্রত্যক্ষ উক্তি পাই না। গল্পে শশীমুখীর যেটুকু পরিচয় পাই—

পাঁচ বছর পর স্বামীকে রান্নাঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, চোখাচোখি হল 'ফরসা মুখ ডগডগে লাল' হয়ে যায়। অর্থাৎ শশীমুখী আর পাঁচজন বাঙালি গৃহবধূর মতোই। আসলে পুরো গল্প জুড়ে মুকুল সকলের কাছেই আগন্তুক হিসাবে গণ্য হলেও প্রকৃত আগন্তুক হয়ে উঠেছে তার স্ত্রীর কাছেই। শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের দেখা হল অনেক পরে। তারা আগে যে ঘরে থাকত সেখানেই তাদের বিছানা করা হয়েছে। কিন্তু —

> "পূর্বের শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের পঁচিশ বৎসর দেখা হয় নাই, ফুলশয্যায় বিছানাই তাই সত্যিকারের ফুল ছিল। এবারের বিরহ মোটে পাঁচ বছরের বিছানাই তাই সুতোর ফুল।"[৭]

শশীমুখী আজ ভেজা মুখ আঁচলে মুছে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে— 'প্রেমে নয়, উত্তজনায় নয়, ভয়ে তাহার বুক ঢিপঢিপ করছে।' কেননা, একটা সময় স্বামী যখন রোজ তার কাছে থাকত তখন শশীমুখীর মুকুলের 'মন জোগাইয়া' চলা খুব সহজ ছিল না। যদিও তখন সে মুকুলের থেকেই নানান নির্দেশ পেত কেমন করে তাকে ভালোবাসবে, কী করলে তাকে খুশি রাখা যাবে। কিন্তু আজকের 'অসাধারণ অবস্থায়' শশীমুখীর কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছে না। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে—

> "মাস্টারের কাছে পড়া-দেওয়ার মতো করিয়া সে তাই বলিল ভালো ছিলে?"[৮]

এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও শশীমুখী গল্পের নামকরণের সার্থকতা দান করেছে। একই সঙ্গে তৎকালীন গৃহবধূর সামাজিক অবস্থা প্রকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে মুকুলও প্রকৃত আগন্তুক হয়ে উঠেছে। এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও শশীমুখী গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরীসৃপ গল্পে আমরা সর্পিল সমাজের পরিচয় পাই। এই সর্পিল জগতে আসলে প্রতিটি মানুষই সরীসৃপ তুল্য। প্রতিটি মানুষের মনই সর্পিল। গল্পে দেখব বনমালী, চারু, পরী প্রত্যেকেরই সর্পিল মনের পরিচয় পাব। প্রত্যেকের মধ্যেই একই সঙ্গে দুটি সত্তা বিরাজমান। প্রত্যেকেরই মুখ এবং মুখোশের আড়ালে রয়েছে আর একটি মুখ। তাই গল্পে বনমালী-চারু, বনমালী-পরী, চারু-পরী প্রত্যেকটি সম্পর্কের সমীকরণে রয়েছে স্বার্থকামী মানুষের সর্পিল মনের পরিচয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পে একমাত্র ভুবন চরিত্রটির মধ্যে কোনো জটিল মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আসলে গল্পে ভুবন গৌণ চরিত্র হিসাবে গণ্য হলেও একমাত্র চরিত্র যে এই সর্পিল জগতে থেকেও নির্মল থাকতে পেরেছে। তাই গল্পে আমরা ভুবনকে বিকৃত চরিত্র হিসাবে পেয়ে থাকি। আসলে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে এই সর্পিল জগতে সহজ-সরল-নিঃস্বার্থ মানুষেরা আসলে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আবার গল্পে ভুবনের এই সহজ-সরলতা বনমালীর মতো হিসেবি, স্বার্থপর, জটিল, কুটিল মানুষের মনেও একপ্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করে থাকে। তাই বনমালীর মতো কুটিল মনের মানুষও ভুবনকে ভালো না বেসে থাকতে পারেনি—

> "চারুর জন্যে পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত, চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে, বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।"[৯]

আসলে এই সর্পিল জগতে ভুবন হল এক টুকরো মানবিকতা। আর এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও ভুবন গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখব ভুবন যেমন এই সর্পিল জগৎ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে মায়ের উদ্দেশ্যে একই রকমভাবে বনমালীর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনটি—

> "দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও ভুবন গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পে আমরা ভুবনের যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তা হল ভুবন স্থুল বুদ্ধির অধিকারী ও সে সকলকেই সহজ-সরলভাবে বিশ্বাস করতে পারে। গল্পে ভুবন একমাত্র চরিত্র যার মধ্যে কোনোরকম সরীসৃপ সত্তা নেই। ভুবন সম্পর্কে চারু যা বর্ণনা দিয়েছে তা এরকম—

> "ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।"[১১]

আর এরকম ভুবনের প্রতি চারুর অদম্য ভালোবাসা দেখে বনমালীর মনে হয়েছে—

> "এই ছেলেকে অত ভালোবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ।"[১২]

গল্পে ভুবনের পরোক্ষে উপস্থিতি থাকলেও প্রত্যক্ষ ভাবে ভুবনের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি একেবারে গল্পের শেষপ্রান্তে এসে। আর এই ভুবনকে কেন্দ্র করেই গল্পের শেষে অন্যান্য চরিত্রগুলির সরীসৃপ সত্তার চরমরূপ প্রকাশিত হয়েছে পাঠকের সামনে। চারুর মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়েও দেখব কিভাবে ভুবনকে কেন্দ্র করে বনমালী ও পরীর চরিত্রের সরীসৃপ সত্তার প্রকাশ ঘটেছে—

> "মানে বুঝুক আর না বুঝুক বনমালী বারকতক তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোন ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।"[১৩]

অন্যদিকে কিছু বলা দরকার বলে পরীও দিদিকে জানাল—

> "ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনও।"[১৪]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে চারুর যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে আমরা চরিত্রগুলির সরীসৃপ সত্তার আঁচ পেয়ে থাকি গল্পে—

> "কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথাও বিশ্বাস করে। চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধহয় ক্ষমতা নাই যে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।"[১৫]

কিন্তু এসবের মধ্যে একমাত্র ভুবন সহজ-সরল মন নিয়ে পরী ও বনমালীকে ভালোবেসেছে তাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। তাই দেখব মাকে ওষুধ খাওয়ানোর কথা বনমালী অন্য একজনকে দায়িত্ব দিলেও ভুবন নিজে থেকেই সে দায়িত্ব নিয়েছে ও বনমালীকে ঠিক সময়ে গিয়ে মনে করিয়েছে। আর এসব দেখে বনমালীর মতো হিসেবি জটিল কুটিল মানুষও ক্ষণিকের জন্য অবিচলিত হয়ে পড়েছে। –

> "কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশি করার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য।"[১৬]

আবার এই ভুবনকে কেন্দ্র করেই দেখব পরীর সর্পিল মনের চরমরূপ প্রকাশ। কিন্তু ভুবন মাসি পরীর চক্রান্তকেও সরল মনে বিশ্বাস করেছে। তাই মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন পরী ভুবনকে বলল—

> "জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।"[১৭]

ভুবন নিষ্পাপ মন নিয়ে পরীর এই কথাগুলোকে বিশ্বাস করেছে। পরীর কথা মতো বেরিয়ে এসে ট্রেনে উঠেছে। আর পরীর কথা মতো পরদিন হাটার সময় ট্রেন থেকে নেমে পড়ারও সম্মতি জানিয়েছি। আর এসবের মাঝেও যেন ভুবন তার সহজ-সরল মন নিয়ে পরীর কুটিল মনের ষড়যন্ত্রকে নিজের অজান্তেই বিদ্রুপ করেছে—

> "খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।"[১৮]

যা শুনে পরী খোকাকে আরও বেশি করে বুকে আঁকড়ে ধরেছে। এভাবে ভুবন গল্পে উপস্থিত থেকে বাকী চরিত্রগুলির সরীসৃপ সত্তাগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। এমনকি নিজের নিঃস্বার্থ আনুগত্য দিয়ে একদিন যে বনমালীকেও সে বিচলিত করতে পেরেছিল গল্পের শেষে সেই বনমালীর সরীসৃপ সত্তার চরম রূপ প্রকাশ হতে দেখি। –

> "একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?
> বনমালী বলিল, আপদ গেছে, যাক।"[১৯]

আর এখানেই ভুবন গল্পে গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বনমালী পরীর মতো মানুষরা কতটা হিসেবি, কঠিন, জটিল, কুটিল মানসের হতে পারে গল্পে এই ভুবন চরিত্রটির উপস্থিতির মাধ্যমে পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। এখানেই গৌণ চরিত্র হিসাবে ভুবন চরিত্রটি সার্থকাত লাভ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিড়ম্বনা গল্পটি একজন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের দশ বছর বিরহে কাটানোর পর পুরোনো প্রেমিকার কাছে ‘বিড়ম্বনার’ গল্প। গল্পটি আষাঢ় ১৩৩৮ সালে আগতা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪৫ সালে মিহি ও মোটা কাহিনী গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র সুকলের নতুন হেডমাস্টার অনন্ত, বুড়ো শিবরাম ও শিবরামের কন্যা মহাশ্বেতা। এছাড়াও উপস্থিত রয়েছে মহাশ্বেতার ছেলে ও মাসি এবং গল্পে পরোক্ষে উল্লেখ রয়েছে অনন্তের স্ত্রী নীলা। গল্পে এরা অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে বিচার্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল গৌণ চরিত্র হয়েও নীলা ক্ষণিকের উপস্থিতির মাধ্যমের গল্পে কী প্রভাব ফেলেছে।

গল্পের আখ্যান যখন প্রায় শেষের দিকে, যখন সাধারণ পাঠক দীর্ঘ বিরহে কাটানো নায়ক-নায়িকার সৌভাগ্যক্রমে আবার দেখা হওয়ার মুহূর্তে মশগুল, যখন আমরা সকলে গল্পের স্বাভাবিক গতিধারা অনুযায়ী ভেবে নিয়েছি এই বিরহী যুগল অর্থাৎ অনন্ত ও মহাশ্বেতার পুনর্মিলন সময়ের অপেক্ষা মাত্র ঠিক তখনই গল্পে প্রথম প্রবেশ ঘটে আলোচ্য গৌণ চরিত্র অর্থাৎ অনন্তের স্ত্রী নীলার। গল্পে আমরা নীলার উপস্থিতি মূলত পরোক্ষে পেয়েছি। গল্পে উপস্থিত মহাশ্বেতার ‘ঝি’-এর মুখ থেকে আমরা নীলা সম্পর্কে যেটুকু জানতে পারি, তা হল—

> “খাঁটি মেম নয় গো, দিশি। কিন্তু কী রূপ দিদি, আহা! মা দুগ্‌গো যেন ফিরিঙ্গি মেয়ে হয়ে এলেন।”[২০]

এছাড়াও আমরা গল্প থেকে জানতে পারি অনন্ত ও নীলার দাম্পত্য জীবন খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না—

> “মাস্টার গগন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে, এই বদস্বভাবের জন্য তোমায় আমি দেখতে পারি না নীলা! যারা গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন?”[২১]

অনন্তের থেকে আমরা আরও জানতে পারি—

> “আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্তিরি হয়েছে।”[২২]

অর্থাৎ এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি স্ত্রী নীলার সঙ্গে স্বামী অনন্তের দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখের ছিল না।

গল্পে আমরা দেখি অনন্ত মহাশ্বেতা কোনো এক সময়ে পরস্পরকে ভালোবাসলেও অনন্তকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয় ও মহাশ্বেতার অন্যথায় বিয়ে হয় ও পরে বৈধব্য নেমে আসে জীবনে। কিন্তু মহাশ্বেতার বাবার সুকলে হেডমাস্টার রূপে অনন্তের আসার সুবাদে দীর্ঘ দশ বছর পর আবার তাদের সাক্ষাৎ হয় আবার অনন্ত এতদিন ধরে ‘কায়ার প্রত্যাখ্যানে’ ‘ছায়া’ নিয়ে কাটিয়েছে এ কথা জানার পর মহাশ্বেতার মনে জীবন সম্পর্কে আবার নতুন করে রঙিন স্বপ্ন জাগে। পাঠকের মনেও ধারণা তৈরি হয় বিরহী নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের কথা। ঠিক এই মুহূর্তে গল্পে নীলার হঠাৎ আবির্ভাব হয় ও প্রেমিক অনন্তকে একই সঙ্গে পাঠককেও বিড়ম্বনার সম্মুখীন করে। গল্পটি হঠাৎ যেন ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে যায়। আখ্যানের হঠাৎ এক বাঁক তৈরি হয় যা কাহিনীকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে দেয়। এভাবেই গৌণ চরিত্র হয়েও নীলা পরোক্ষে একবার মাত্র উপস্থিত থেকে কাহিনী ধারায়, মুখ্য চরিত্রের উপর একই সঙ্গে গল্পের নামকরণের প্রভাব ফেলেছে। চরিত্রটি গৌণ হয়েও তাই গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নীলা সম্পর্কে গল্পে যেটুকু পরিচয় পায়। তা পুরোটাই ঝি-এর দেওয়া বর্ণনা থেকে—

> “গটগট করে বাড়ির ভিতর ঢুকল এক ফিরিঙ্গি খেস্তান মেমসায়েব।”[২৩]

আরো বলেছে—

> “খাঁটি মেম নয় গো, দিশি। কিন্তু কী রূপ দিদি, আহা? মা দুগগো যেন ফিরিঙ্গি মেয়ে হয়ে এলেন। পায়ে জুতো মোজা, ঘাঘরার মতো শাড়ি পরা, গলায় লিকলিকে সরু হার।”[২৪]

আবার ঝি-এর বর্ণনা থেকে যা শুনতে পায় তা থেকে অনুমান করাই যেতে পারে যে নীলার— হেডমাস্টারের দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখকর ছিল না। কেননা হেডমাস্টারের কথা থেকে জানতে পারি তিনি নীলার আগমনে সম্মতি জানায় নি—

> "তুমি কোথা থেকে এলে নীলা? তোমায় না আসতে বারণ করেছিলাম?"[২৫]

এরপরেই শুরু হয় বিষম ঝগড়া। যা ঝি-এর কথায় 'খুনোখুনি' হওয়ার যোগাড়। মাস্টার গগন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—

> "যারা গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যাও আমার কাছে এসেছ কেন? মেয়েটা বললে, আমার কী দোষ! তোমার কাছে আমি কোনো অপরাধ করিনি। মাস্টার তাতে আরো চেঁচিয়ে বললে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্তিরি হয়েছে, এই দোষ।"[২৬]

অতএব মাস্টারের বক্তব্য থেকে আমরা ধারণা করতে পারি নীলার সঙ্গে তার বিবাহটাও 'বিড়ম্বনা'র সম্মুখীন হওয়ার কারণে। তাই নিজের এক সময়ের 'বিড়ম্বনা' কাটানোর জন্য করলেও মন থেকে সেই বিয়েকে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে এই খবর শোনার পরেই মহাশ্বেতা—

> "লাটিমের মতো সারা বাড়িতে শ্বেতা একা পাক খেয়ে বেড়াতে লাগাল, ভিতরের অস্থিরতার সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য রেখে যতটুকু স্বস্তি মেলে।"[২৭]

এভাবে আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্র নীলা একবারমাত্র ক্ষণিকের উপস্থিতির মাধ্যমে সমগ্র গল্পটিকে এক ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে। গল্পে শ্বেতা-অনন্তের মধ্যে এক 'বিড়ম্বনা'র পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আর তাই একবার বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে অনন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলাকে বিবাহ করেছিল আর এবারেও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুকল, গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। আর একই সঙ্গে পাঠকদের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে গল্পের নামকরণেও প্রভাব ফেলেছে আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলুদ পোড়া গল্পটি গল্পের শিরোনামাঙ্কিত গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জুন ১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি মূলত দুটি আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। দুটি মার্ডারকে কীভাবে একটি অতিলৌকিক ন্যারেটিভ হিসাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তারই গল্প হলুদ পোড়া গল্পটি। তারাশঙ্করের বন্দিনী কমলা গল্পে যেভাবে রায়বাড়ির একটি মার্ডারের ঘটনাকে মিথ হিসাবে দেখানো হয়েছে ঠিক একই রকম ভাবে দেখানো হয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। আর এই পুরো ন্যারেটিভ সেট করতে গল্পে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় গল্পে অপ্রধান চরিত্র হিসাবে পরিচিত বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল, তারই পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এবারে আমরা আলোচনা করব গৌণ চরিত্র হয়ে পঙ্কজ ঘোষাল গল্পটির উপর কী প্রভাব ফেলেছে।

গল্পটি শুরু হচ্ছে বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আর দুটি মৃত্যুই যে স্বাভাবিক নয় তা আমরা গল্পের আখ্যান থেকে জানতে পারি। গল্পের অন্যান্য চরিত্রের মতো যখন সাধারণ পাঠকরাও দুটি মৃত্যুর মধ্যে যোগসাজশ খুঁজে বের করতে অক্ষম, তখন গল্পে আবির্ভাব হয় বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো নবীনের। নবীন চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে এসে সম্পত্তির ভার নিয়ে ঘোষণা করল—

> "কাকাকে যারা অমন করে মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে না পারি।"[২৮]

পাঠকের মনে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টির আগেই গল্পে দেখি একটি ঘটনা ঘটে। নবীনের বউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গল্পে প্রথম উপস্থিতি ঘটে আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্র তথা বুড়ো পঙ্কজ ঘোষালের এবং উপস্থিতিতেই সক্রিয় হয়ে পুরো গল্পটিকে নিজের মতো করে চালনা করে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন মাত্র শিক্ষিত বীরেন যখন দামিনীর অসুখ সারাতে না পেরে শহরের ডাক্তার ডাকার কথা বলে তখনই পঙ্কজ ঘোষাল তীব্র প্রতিবাদ জানায়—

> "ডাক্তার? ডাক্তার কী হবে? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।"[২৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এভাবেই আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি গল্পের কাহিনীকে একেবারে ভিন্নপথে প্রবাহিত করে দিল। আর এরপর দেখব কুঞ্জ এসে নানারকম তুকতাক করে দামিনীর নাকের সামনে হলুদ পোড়া ধরলে দামিনী বলে উঠল, 'আমি শুভ্রা'। আর এই সুযোগে আবার পঙ্কজ ঘোষাল জানতে চাইল শুভ্রাকে কে মেরেছে। যার উত্তরে দামিনী জানাল—

> "দামিনী নিজে থেকেই ফিশফিশ করে জানিয়ে দিল, বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।"[৩০]

আবার মানুষের মনে যখন প্রশ্ণ উঠল তিন দিন আগে মরে যাওয়া মানুষের পক্ষে শুভ্রাকে খুন করা কীভাবে সম্ভব! তখনও আবার এই পঙ্কজ ঘোষালকে দেখব একটি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে—

> "শুধু জ্যান্ত মানুষ কী মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে-মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কীসে!"[৩১]

এরপর গ্রামের মানুষদের কাছে অবিশ্বাসের কোনো কারণ থাকে না। আর পঙ্কজ ঘোষালের তৈরি করা এই ন্যারেটিভ কখন অজান্তে বীরেনের মতো শিক্ষিত মানুষকেও বিকারগ্রস্থ করে তোলে, তাই গল্পের শেষে বীরেন অচৈতন্য হয়ে আর্তনাদ করতে করতে বলতে থাকে—

> "আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।"[৩২]

এভাবে গল্পে গৌণ চরিত্র হয়েও পঙ্কজ ঘোষাল সচেতন পাঠকের কাছে যে মৃত্যু দুটি মার্ডার হিসাবে বিবেচিত তাকে কীভাবে একটি ন্যারেটিভ তৈরি করে তাকে কাহিনীতে অলৌকিক ঘটনায় রূপান্তরিত করেছে তার পরিচয় পাই। আর এখানেই চরিত্রটি গৌণ হয়েও গল্পের ন্যারেটিভ তৈরিতে, গল্পের কাহিনীতে সর্বোপরি গল্পের নামকরণেও প্রভাব ফেলেছে। আর এখানেই চরিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরাবাঁধা জীবন গল্পটি আশ্বিন ১৩৪৮ নর নারী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি মানিকের প্রকাশিত তৃতীয় গল্প। আবার ভাদ্র ১৩৪৯-এ প্রকাশিত ধরাবাঁধা জীবন উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের শুরু থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গল্পের প্রয়োজনে অল্প বিস্তর পরিবর্তনসহ আলোচ্য গল্পে গৃহীত হয়েছে। কোনো পূর্ব প্রকাশিত গল্প উপন্যাসে গ্রহণ বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপন্যাস থেকে নির্মিত গল্প, এ-জাতীয় সর্বমোট প্রায় তিরিশটির মতো গল্পের মধ্যে ধরাবাঁধা জীবন একমাত্র গল্প যার শিরোনাম এবং উপন্যাসের শিরোনাম অভিন্ন।[৩৩]

গল্পটি মূলত ভূপেন ও প্রভার গল্প। যারা তাদের 'ধারাবাঁধা জীবন' ছেড়ে বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বার্থকামী পরিবারের নির্লিপ্ততা তাদের এই শেষ আশাটিতেও বাঁধ সেজেছিল। একটা সময় বউ আর সন্তান মারা যাওয়ার পর ভূপেন নির্লজ্জের মতো বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল প্রভাকে। কিন্তু দুই স্বার্থকামী সংসারের 'ভীত সন্ত্রস্ত' রূপ আর তাদের এক হতে দেয়নি। ভূপেন ও প্রভা ছাড়াও গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি হল ভূপেনের বউদি ও প্রভার দাদা প্রসন্ন। এছাড়াও গল্পে পরোক্ষে উপস্থিত রয়েছে মনু। অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে আমরা এদের বিবেচনা করতে পারি। আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্র দুটি হল— ভূপেনের বউদি ও প্রসন্ন। এবারে আমরা আলোচনা করব গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে বউদি কী প্রভাব ফেলেছে।

গল্পে যখন প্রভা ও ভূপেন সাময়িক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আবার তারা বিবাহ-বন্ধনে লিপ্ত হওয়ার ভাবনায় একে অপরের কাছে আসার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই এক তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে গল্পে প্রথম উপস্থিত হয়েছে আলোচ্য গৌণ চরিত্র অর্থাৎ ভূপেনের বউদি—

> "হঠাৎ দুজনে আবার কী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে দ্যাখো।"[৩৪]

আসলে, 'প্রভা বাড়িতে বউ হইয়া আসিলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে ভাবিতে গেলেও বউদির বুক ধড়ফড় করে'[৩৫] আর এরপর আমরা বউদির আপত্তির মূল কারণটি জানতে পারি—

> "বিবাহ করার সাধ হইয়া থাকে সরমার মতো আরেকটি ভীরু নরম বউ আসুক কর্তালি করার অভ্যাস যার নাই, সব বিষয়ে যে বউদির মুখ চাহিয়া থাকিবে।"[৩৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি চরিত্রটি সাংসারিক দিক থেকে প্রচন্ড হিসেবী ও স্বার্থকামী নারী। যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভূপেন ও প্রভার মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শুধু বাঁধা হয়েই থাকেনি একই সঙ্গে ভূপেনের জীবন-ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে।

গল্পে আমরা দেখব এরপরই বউদি—

> "তাড়াতাড়ি একটি মেয়েকে একদিন বাড়িতে আনিয়া সে ভূপেনকে দেখাইয়া দিল।"[৩৭]

এবং কান্নাভেজা চোখে এও জানাল মেয়েটির চাল-চলন কথাবার্তা স্বভাব সব যেন সরমার মতো। সরমার মৃত্যুর পর ঘর ও সবার বুকে যে খালি স্থান তৈরি হয়েছে তা এই মেয়েটিই পূরণ করতে পারবে। আর তাই স্ত্রী বর্তমানে যে ভূপেন প্রভার কথা ভাবত। বউ ও ছেলে মরার পরপরই নির্লজ্জের মতো যে ভূপেন প্রভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় বউদির কথা শোনার পর সেই ভূপেন এবারে ভাবতে থাকে—

> "প্রভাকে বিবাহ করার কথা ভাবা যায় কিন্তু সরমার বিনিময়ে তাকে বাড়িতে আনিবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই মেয়েটিকে সে ভাবে, ভাবা চলে।"[৩৮]

আর এরপর থেকেই গল্পে আমরা দেখব ভূপেন সারাক্ষণ সরমার অভাববোধ করতে থাকে। গল্পের শেষে তাই সরমার অভাব পূরণে বউদির আনা সেই মেয়েটি অর্থাৎ মনুকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে যায়। এইভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি পূরণের জন্য গৌণ চরিত্র হিসাবে পরিচিত বউদি ভূপেন ও প্রভার মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। আসলে গৌণ চরিত্র হয়েও বউদি নিজের ভাবনার দ্বারা গল্পের প্রধান চরিত্র ভূপেনের জীবন-ভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে। আর এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও বউদি চরিত্রটি গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত প্রসন্ন চরিত্রটিও গল্পে কী প্রভাব ফেলেছে সেদিকেও আলোকপাত করব। গল্পে প্রসন্নের যেটুকু পরিচয় পায় তা হল— প্রসন্ন প্রভার দাদা ও সে পঁচাত্তর টাকার মাইনের একটা চাকরি করলেও সংসার চালানোর ক্ষেত্রে বোনের উপর নির্ভরশীল—

> "সংসারের খরচের জন্য টাকা চাহিতে গিয়া বোনের কাছে অপমানিত প্রসন্ন কিছুক্ষণের জন্য এমন কথাও ভাবে যে, এর চেয়ে নিজের পঁচাত্তর টাকাতে সংসার চালানোর চেষ্টা করাও ভালো।"[৩৯]

কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব নয়। তাই প্রভা ও ভূপেনের ভাবি মিলনের কথা কল্পনা করে ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করে প্রসন্ন। তাই সে চাকুরিজীবী বোনকে ফেমিনিজমের পাঠ দেয়—

> "ভারী অগৌরবের বিষয় হয়। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার চায়, অথচ স্বাধীনভাবে থাকবার সুযোগ পেলেও নিজেরাই সেটা বজায় রাখতে পারে না। সাধে কি পুরুষজাত মেয়েদের দাবিয়ে রাখে।"[৪০]

কিন্তু পরক্ষণেই প্রভা তার দাদার ভেকধারী মুখোশটা খুলে দেয় পাঠকের সামনে বেরিয়ে আসে একজন স্বার্থকামী মানুষ—

> "প্রভা মৃদু হাসিয়া বলে, তুমি যেমন বউদিকে রেখেছ?"[৪১]

এরপরেই আমরা প্রসন্নের আসল সংসয়ের কারণটা জানতে পারব—

> "নিজের চাকরির পঁচাত্তর টাকায় সংসার চালানোর কথা ভাবিলে প্রসন্নের কপাল ঘামিয়া ওঠে! প্রথম প্রথম প্রভা অবশ্য সাহায্য করিবে, কিন্তু সে আর কতদিন। তার ছেলেমেয়ে হইবে, সংসার গড়িয়া উঠিবে, তখন কি আর মনে থাকিবে বাপ, দাদা, ভাইপো, ভাইঝির কথা? অথচ স্পষ্ট করিয়া ওরা কিছুই বলিবে না। এরকম সংশয়ের মধ্যে মানুষ থাকিতে পারে?"[৪২]

এইভাবে এই স্বার্থকামী মানুষগুলো প্রভা ও ভুবনের ভাবী মিলনের কথা ভেবে শঙ্কিত বোধ করেছে এবং নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে তাদের মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গল্পে যেমন বউদির ভাবনার দ্বারা ভুপেন প্রভাবিত হয়েছিল একইরকম ভাবে প্রসন্নের ভাবনার দ্বারাও প্রভা প্রভাবিত হয়েছে। তাই—

> "প্রভা ঘরের চারিদিকে তাকায়। এ-ঘর ছাড়িয়া ভুপেনের বাড়িতে একটা ঘরে তাকে বাস করিতে হইবে। বাহিরে বারান্দায় গিয়া প্রভা সংসারের কলরব শোনে, আপনজনের চলাফেরা চাহিয়া দেখে। ভুপেন যেমন তার বাড়ির সংসারটির কর্তা, সে-ও তেমনি এই সংসারের কর্ত্রী। তার টাকায় তার নির্দেশে এই সংসার চলে। তাকে গিয়া চালাইতে হইবে ভুপেনের সংসার। সে টাকা পাঠাইবে কিন্তু তার এই সংসারে কর্তৃত্ব

> করিবে অন্য একজন। তার প্রচলিত নিয়ম আর ব্যবস্থাগুলিও হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে দু-দিনের মধ্যে।"[৪৩]

আর তাই এরপর যখন ভুপেন নিজে প্রভাকে বিবাহ প্রস্তাব দিলে এবারে সে আর সম্মতি জানায় না। তাই তো গল্পের শেষে ভুপেন তার বউদিকে বলে—

> "ভুপেন গম্ভীর মুখে বলে, কলকাতায় চলবে না। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না, আরও ক-মাস ছুটি নিয়ে সিমলা যাব ভাবছি। ওদের বলে দিয়ো, বিয়ে যদি দিতে হয় মেয়ের, সিমলায় গিয়ে সব ঠিক করুক। নইলে কাজ নেই।"[৪৪]

এভাবে আলোচ্য গৌণ চরিত্র দুটি নিজেদের জীবনভাবনার দ্বারা গল্পের প্রধান চরিত্রদুটিকে প্রভাবিত করেছে। তাদের ভাবী মিলনের বাঁধা হয়ে তাদের জীবনকে একেবারে 'ধরাবাঁধা জীবনে' আবদ্ধ রেখেছে। এভাবে গল্পের নামকরণে গৌণ চরিত্রদুটি প্রভাব ফেলেছে। আর এখানেই অপ্রধান চরিত্র হয়েও গল্পে বউদি ও প্রসন্ন চরিত্র দুটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের এক কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সমাজে কিছু স্বার্থসিদ্ধি মানুষের জন্য তৈরি হয়েছিল 'কালোবাজারের'। সে বাজারের সবকিছুর বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল। বাদ যায়নি মানুষের মূল্যবোধ এমনকী নিষ্পাপ ভালোবাসাও। এরকমই এক সময় প্রেক্ষাপটে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালোবাজারের প্রেমের দর গল্পটি। গল্পটি ছাড়পত্র পত্রিকায় শারদীয় ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কালোবাজারের প্রেমের দর অর্থাৎ গল্পটির নামকরণ থেকেই আখ্যান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আলোচ্য গল্পে দেখব কীভাবে ধনঞ্জয় ও লীলার গভীর ভালোবাসার দাম নির্ধারিত হয় কালো বাজারের মার্কেটে। গল্পে প্রধান চরিত্র হল ধনঞ্জয় ও লীলা। এছাড়াও উপস্থিত রয়েছে লীলার বাবা পশুপতিবাবু ও মোটা নিরঞ্জন। এরা মূলত গল্পে অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত। আমাদের আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি হল মোটা নিরঞ্জন। এবারে আমরা দেখব গল্পে অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত থেকে কীভাবে গল্পে প্রভাব ফেলেছে।

ব্যবসা উপলক্ষে ধনঞ্জয় ও লীলার মাসখানেক বিচ্ছেদে থাকার পর তারা যখন তাদের এত দিনের সম্পর্কটিকে ভালোবাসা হিসাবে বুঝতে পারে এবং পশুপতিবাবুর সম্মতিতে যখন দুজনের বিবাহ নিশ্চিত ঠিক তখনই গল্পে প্রথম প্রবেশ ঘটে আলোচ্য গৌণ চরিত্রটির। যদিও গল্পে প্রথম উপস্থিতি পরোক্ষে। নিরঞ্জন সম্পর্কে গল্পে যেটুকু আমরা জানতে পারি ধনঞ্জয়ের কথায়—

> "লোকটা নিজে এতটুকু রিস্ক নেবে না, সব নিয়ম দুরস্ত হওয়া চাই! কোনদিকে ফাঁক থাকলে চলবে না। অথচ এদিকে চাহিদাটি ঠিক আছে।"[৪৫]

আর লীলার কথায়—

> "মোটা নিরঞ্জন তো? গোলমাল করবে না মনে হয়। ... লোকটা খুব শিভালরাস।"[৪৬]

অর্থাৎ উপরের কথোপকথন থেকে আমরা অনুমান করতে পারি নিরঞ্জন একজন ক্রেতাদুরস্ত ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতিনিধি। আর এই ক্রেতাদুরস্ত বুদ্ধি দিয়েই গল্পে দেখব কীভাবে লীলা ও ধনঞ্জয়ের এতদিনের ভালোবাসার মূল্যও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এভাবেই গল্পের গৌণ চরিত্র হয়েও নামকরণ ও কাহিনীর পরিণতিকেও প্রভাবিত করেছে।

গল্পে আমরা দেখব এই কালোবাজারে দাঁড়িয়েও লীলা ও ধনঞ্জয়ের এতদিনের ধারণা ছিল—

> "জগতে অন্য সমস্ত কিছুর দরদাম আছে, ...প্রেম অমূল্য। কারণ প্রেম তো কোনো বস্তু নয়— মাল নয় যে দাম দিয়ে কেনা যাবে।"[৪৭]

কিন্তু তাদের এতদিনের ধারণাকে নিমেষে ধ্বংস করে দেয় গল্পে উপস্থিত গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত মোটা নিরঞ্জন—

> "নিরঞ্জন স্বয়ং ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।"[৪৮]

ধনঞ্জয় নিজের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করার প্রত্যাশায় নিরঞ্জনের কাছে গেলে—

> "শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে, কিন্তু বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হচ্ছি ভাই। তুমি চেনো, পশুপতিবাবুর মেয়ে।[৪৯]

এরপর একটু হাসিমুখে বলে—

> পশুপতিবাবু অনেকদিন ঘোরাফেরা করছেন— এ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। এবার কিছু করে দিতে হবে। তোমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি— অন্য কেউ হলে এই কন্ট্রাক্টই পশুপতিবাবুকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা— তোমাকে তো আর না বলতে পারি না এখন।[৫০]

এভাবেই কালোবাজারের মার্কেটে লীলা ও ধনঞ্জয়ের প্রেমের মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তাদের এতদিনের ভালোবাসার মূল্য হয়ে দাড়ায় একটা ব্যবসায়ী 'কন্ট্রাক্ট'। আর তাই কথাটা শোনার পর — 'ধনঞ্জয় ও লীলা' দুজনেই সারা রাত জেগে কাটায় — মাইলখানেক তফাতে শহরের দুটি বাড়ির দুখানা ঘরে, যে ব্যবধান তারা যে কেউ একজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটে ঘুচিয়ে দিতে পারে।' কিন্তু এই 'ব্যবধান' ঘোচে না কেননা তারা 'ছেলেমানুষ' নয়। তাই তারা এই কালোবাজারে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রেমের নির্ধারিত মূল্য মেনে নেয় হয়তো-বা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর এখানেই গৌণ চরিত্র হয়েও গল্পে নিরঞ্জন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিক্ষুক গল্পে দেখব করুণামিশ্রিত মিথ্যে কাহিনীর আশ্রয় করে কীভাবে মানুষ পরিশ্রমহীন উপার্জনের ব্যবস্থা করে নেয়। গল্পের প্রধান চরিত্র যাদব দীর্ঘদিন শহরে কাজ করার পর শ্বশুরবাড়ি ফিরেছে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের নিজের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু স্টেশন থেকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার নির্জন রাস্তাটুকু রাতের বেলা একা একা জমানো টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে। মনের দোটানা ভাবনা নিয়ে রাতের অন্ধকারে একা একা পথ চলতে আরম্ভ করলে রাস্তায় একজন সঙ্গী জুটে যায়। সঙ্গীর নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যাদবের মনে নিজ নিরাপত্তাজনিত সন্দেহ জাগে। ফলত ছেলের কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার মিথ্যে গল্প শোনায়। এরপর দেখি পথ শেষে সঙ্গীটি ছেলের চিকিৎসার জন্য তাকে দশ টাকার একটি নোট দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যাদবের—

> "প্রথমে কেমন বিস্ময় জাগিয়াছিল, তেমনি হইয়াছিল আনন্দ। সকলকে শহরে নেওয়ার খরচটা ভগবান জুটাইয়া দিলেন। ঘরের পয়সা আর খরচ করিতে হইবে না।"[৫১]

এইভাবে গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত সঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত চরিত্রটি ক্ষণিকের মাত্র উপস্থিতিতে যাদবের মনে একপ্রকার বিশ্বাসের সৃষ্টি করলেন যা তাকে বিনা পরিশ্রমের উপার্জনের পথটি তৈরি করে দিল। কেন না গল্পে আমরা এরপর দেখব শহরে গিয়েও যাদব একই রকম ভাবে রাস্তার মানুষকে তার বানানো গল্প শোনায় ও তাদের থেকে সে সাহায্য পায়। এমনকি সদ্য সন্তানহারা পিতার থেকেও সে পাঁচ টাকার সাহায্য নিয়েছে। আবার এই উপার্জনের নতুন উপায়টিতে সে যেন আরও বেশি সময় দিতে পারে তাই—

> "আগে যাদব হাঁটিয়াই যাতায়াত করিত। আজকাল সময় বাঁচানোর জন্য ট্রামে চাপে।"[৫২]

এখানেই গল্পে গৌণ চরিত্র হয়েও সঙ্গী চরিত্রটি কাহিনী নির্মাণে গল্পের নামকরণে ও সর্বোপরি যাদবের অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের উপায় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই শহরে পরিবার নিয়ে আসার পর সংসারের অভাব অনটনের কারণে খাটুনিটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে এখন তার। এরপর সে ভাবতে থাকে সহজে টাকা রোজগার করার উপায়। এ প্রসঙ্গেই সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়ে। তখন তার মনে হয়—

> "ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হয় দয়ালু লোক কি জগতে সেই একজনই ছিল, আর নাই শহরের এই লাখ লাখ লোকের মধ্যে? মর্মস্পর্শী করিয়া দুঃখ দুর্দশার কাহিনি সে কি একবারেই বলিতে পারিয়াছিল, আর পারিবে না?"[৫৩]

মনে এই প্রশ্ন জাগার পরেই একদিন সে কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে চেষ্টা করে দেখল ও অসফল হল। কিন্তু তবুও সে এই বিনা পরিশ্রমের অর্থ উপার্জনের সহজ পথটি ত্যাগ করতে পারল না। আবার পরদিন বন্ধুদের সাথে সারারাত ফূর্তি করার পর অফিস যাওয়ার পথে এক ভদ্রলোকের কাছে বলতে শুরু করে—

> "আমি বড়ো বিপদে পড়েছি, আমার বড়ো ছেলের কাল থেকে কলেরা। ওষুধ কিনবার পয়সা নেই— আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন।"[৫৪]

এবারে যাদব সফল হয়। কেননা—

> "বিব্রত ও বিরক্ত ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়া মানিব্যাগটা বাহির করেন। প্রথমে একটা সিকি বাহির করিয়া যাদবের দিকে একবার তাকান সমস্ত রাত ফূর্তি করার ফলে মুখখানা যাদবের এমনি শুকনো দেখাইতেছিল সে সিকিটা বদলাইয়া গোটা একটা আধুলি তাকে দান করিয়া বসেন।"[৫৫]

এভাবেই যাদব রোজগারের সহজ উপায়টি আসতে আসতে করায়ত্ত করে ফেলেছে। তাই এখন সে পুরোনো কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে চুলে তেলও দেয় না, আঁচড়ায়ও না, ছেঁড়া জামাকাপড় ও ছেঁড়া জুতো পড়ে মানুষকে তার দুঃখ দুর্দশার কাহিনি শোনায়। মানুষের দয়ায় যেন তার অধিকার রয়েছে, তাই কেউ সাহায্য না করে চলে গেলে এখন সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। এভাবেই তার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়— চেহারায়, চলনে, পোশাকে বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকই মনে হয়। লোকটি যাদবকে ডেকে বলে—

> "লোকটি মৃদু একটু হাসে, বলতে এমন লজ্জা বোধ হচ্ছে মশাই। আমি থাকি শেওড়াফুলিতে, একটু দরকারে আজ কলকাতা এসেছিলাম। দোকানে কয়েকটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি। কোন ফাঁকে কখন যে কে পকেটটা কেটে মানিব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছে, টেরও পাইনি। পাঞ্জাবির ডানদিকের পকেটটা তুলিয়া দেখায়, সত্যই পকেটটা কাঁচি দিয়া কাটা। রিটার্ন টিকিটটা পর্যন্ত সে ব্যাগের মধ্যে ছিল। মহা মুশকিলে পড়েছি, কাউকে চিনি না শহরে, কী করে যে এখন টিকিটের দামটা—"[৫৬]

আমরা সাধারণ পাঠকরা যখন দেখার অপেক্ষায় রয়েছি অন্যের বিপদের কাহিনি শোনার পরে যাদব কি প্রতিক্রিয়া দেখায়, তখনই গল্পে আমরা দেখি—

> "স্তম্ভিত যাদব তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, যেভাবে জুনিয়ার উকিল হাঁ করিয়া শোনে বিখ্যাত আইনজীবীর বক্তৃতা।"[৫৭]

আর তখন আমরা পাঠকরাও বিস্ময়ভূত হয়ে পড়ি। সমাজের মানুষের দয়া, করুণার সহায়তাকে নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করা দেখে। এভাবে আলোচ্য গল্পে 'সঙ্গী' নামে চিহ্নিত গৌণ চরিত্রটির দয়া, করুণা বা 'সঙ্গী' নামক মানুষটির মতো দয়ালু আরো অনেকে প্রতিনিয়ত নিজেদের দয়ার দ্বারা সমাজে যাদবের মতো কর্মজীবী মানুষকে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করে দেয়। আর এখানেই গল্পের নামকরণ সার্থকতা লাভ করেছে। এভাবেই গল্পে আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি গল্পের প্রধান চরিত্রের জীবন ভাবনাকে একই সঙ্গে গল্পের নামকরণকে প্রভাবিত করেছে। এভাবে চরিত্রটি অপ্রধান হয়েও গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মন্বন্তরকালীন একটি মৃত্যু কীভাবে এত দিনের নিরাপদ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নগ্ন বাস্তবের সামনে দাড় করিয়ে দিল তারই গল্প হল কে বাঁচায়, কে বাঁচে! গল্পের প্রধান চরিত্র মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবি মৃত্যুঞ্জয় যে 'এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা।' আজ আপিস যাবার পথে প্রথম মৃত্যু দেখল - 'অনাহারে মৃত্যু।' আর এই একটিমাত্র মৃত্যু কীভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনে ও তার পরিবারে সর্বোপরি সমাজের কতটা প্রভাব ফেলল তারই গল্প হল আলোচ্য গল্পটি। আলোচ্য গল্পে আমরা গৌণ চরিত্র হিসাবে অনাহারে মৃত ব্যক্তিটিকে বিবেচনা করতে পারি। যদিও চরিত্রটির গল্পে কোনো নাম নেই। কেননা চরিত্রটি আসলে ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে নয়, আসলে চরিত্রটি শ্রেণি প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত রয়েছে গল্পে। গল্পের পাঠ ও তৎকালীন সময়ের ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি এই মন্বন্তরকালীন খাদ্য সংকটের জন্য বহু গ্রামের মানুষ শহরাঞ্চলে উঠে এসেছিল ও কিছু দিন অনাহারে থাকার ফলে ফুটপাথেই তাদের মৃত্যু হত। অর্থাৎ গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত এই মৃত ব্যক্তিটি সেই গ্রাম থেকে উঠে আসা অনাহারে মৃত ব্যক্তিদেরই শ্রেণি প্রতিনিধি চরিত্র। চরিত্রটি একবার মাত্র পরোক্ষে উপস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের মত মানুষদের প্রতি দরদী প্রতিবাদ জানাল। আর এরপরেই দেখব গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কীভাবে এই মৃত্যুর জন্য নিজের কিছু না করতে পারা, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটানোকে দায়ি করেছে। টুনুর মা'র মুখ থেকে জানতে পারি---

> "কিছুই কী করা যায় না? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।"[৫৮]

গল্পে তাই দেখব মৃত্যুঞ্জয় একটা সময় অফিস, পরিবার সবকিছু ছেড়ে এই অনাহারে ফুটপাথে থাকা মানুষগুলির সঙ্গ নিয়েছে। 'পরনে ধূতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া।' লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খায়। বলে 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।' আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রেণি প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় তার না পারার হতাশা থেকে মুক্তির জন্য নিজেই আশ্রয় নিয়েছে এই সর্বহারা শ্রেণির মাঝে। এভাবে গল্পের গৌণ চরিত্র হয়েও মৃত ব্যক্তি নিজের ক্ষণিকের উপস্থিতিতে গল্পের প্রধান চরিত্রের উপর সর্বোপরি গল্পের নামকরণকেও প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য গৌণ চরিত্রটি শুধুমাত্র মৃত্যুঞ্জয়কেই প্রভাবিত করেনি, পরোক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী তথা টুনুর মা এবং নিখিলকেও প্রভাবিত করেছে। তাই টনুর মা অসুস্থ হয়ে বিছানা নিলে নিখিলকে সকরুণ আবেগে জানান মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে পাশে থাকার জন্য। আর তখন নিখিল তাকে এ প্রসঙ্গে সুস্থ হয়ে ওঠার কথা বললে টুনুর মা বলে---

> "উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।"[৫৯]

যা শুনে হতবাক হয়ে যায় নিখিল। কিন্তু টুনুর মা আরও জানান—

> "ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলই মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা।"[৬০]

আবার একই রকম ভাবে পরোক্ষে নিখিল-এর জীবন ভাবনায় প্রভাব ফেলেছেন সেই মৃত ব্যক্তিটি। তাই যে নিখিল গল্পের শুরুতে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় যে যুক্তিগুলো দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে বোঝানোর চেষ্টা করত, গল্পের শেষে সেই নিখিলকেই দেখব—

> "ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে-ও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উলটো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়।"[৬১]

এভাবেই গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে বিবেচিত অনাহারে মৃত ব্যক্তিটি গল্পের প্রধান চরিত্রগুলির জীবনযাপনাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। একই সঙ্গে গল্পের নামকরণের সার্থকতা দানেও সহায়তা করেছে। আর এখানেই চরিত্রটি গৌণ হয়েও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিনের দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক রাগে-অনুরাগে, প্রেমে-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি গল্প স্বামী-স্ত্রী। বৈশাখী বার্ষিক পত্রিকায় ১৩৫০ সালে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও প্রথমে স্বামী-স্ত্রী প্রেম শিরোনামে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে গল্পের শিরোনামে থেকে 'প্রেম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ গোপাল-মেনকা গড়পড়তা মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল। জীবনানন্দের ভাষায় তাদের দাম্পত্য প্রতিদিনের অভ্যাসে 'ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত ব্যবহৃত...' হয়ে দিন দিন যেন ভালোবাসাটা যেন কেমন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। গোপাল অফিস ও বই পড়ে জীবন কাটাচ্ছিল, অন্যদিকে দেওর ননদ, শাশুড়িতে ভরা সংসারে নিত্য অভাব-অভিযোগ নিয়ে মেনকাও দিন কাটাচ্ছিল। এর মধ্যে তাদের জীবনে উপস্থিত হয় অতিথিরূপে রসিক ও রসিকের স্ত্রী। আর এই রসিকের স্ত্রীকে নানাভাবে খুশি করার আছিলায় বারবার গোপালের তার কাছে যাওয়াকে ঠিক সহজভাবে মেনকা মেনে নিতে পারছিল না। যদিও মেনকার এই ঈর্ষা স্ত্রী স্বভাবজনিত। আর এরপরেই দেখব গোপাল ও মেনকা যারা এতদিন পাশাপাশি শুয়েও নিজেদের স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায় ভালোবাসাটা হারিয়ে ফেলেছিল। সেই ভালোবাসার যেন পুনরুদ্ধার ঘটল রসিকের স্ত্রীর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। তাই আজকের এই একটি মাত্র রাত্রির বিচ্ছেদ-বেদনা যেন দু'জনকেই কাতর করে তুলেছে। ক্ষণিকের বিচ্ছেদ যেন দুজনের কাছেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই আজ গোপাল-মেনকা খোলা ছাদের পাটি ও একটি বালিশে শুয়ে স্বস্তি বোধ করল। দু'জনেই মাঝরাত্রিতে নানা অজুহাত দেখিয়ে একসঙ্গে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করল। গল্পের শেষে তাই দেখি---

> "গোপাল জড়িয়ে ধরতে কিছুক্ষণ তার শ্বাস বন্ধ হয়ে রইল। আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। একটা বালিশেই হবেখন।"[৬২]

এই ভাবেই আলোচ্য গল্পে গৌণ চরিত্র হিসাবে উপস্থিত রসিকের স্ত্রী ক্ষণিকের মাত্র উপস্থিতিতে গোপাল ও মেনকার জীবনে তাদের হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার পুনরুত্থান ঘটাল। এখানেই চরিত্রটি গৌণ হয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে গল্পে।

আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পে গৌণ চরিত্রগুলির মাধ্যমে কখনো সমাজের শ্রেণিবিন্যাসের নগ্ন বাস্তবরূপ, কখনো মানব মনের জটিল কুটিল মনের পরিচয় উদ্ঘাটনে আবার কখনো কখনো মধ্যবিত্ত জীবনে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা, মূল্যবোধের পুনরুত্থানে আবার তৎকালীন সময়ে সমাজে নারীর অবস্থানও বুঝিয়েছেন। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু একজন সমাজ সচেতন শিল্পী, তাই সমাজের বিভিন্ন দিকগুলো তার গল্পে উঠে এসেছে। আর সেগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে এই গৌণ চরিত্রগুলোর। যেমন 'হলুদ পোড়া' গল্পটির মাধ্যমে সমাজের একেবারে কালো দিকটিকে তুলে ধরেছেন। কীভাবে কুসংস্কারের সহায়তা নিয়ে সমাজে একশ্রেণির মানুষ নিজেদের অন্যায় অপকর্মকে চাপা দেয় তা দেখানো হয়েছে আলোচ্য গল্পে গৌণ চরিত্রের সহায়তা নিয়ে। আবার স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কায়েম করতে গিয়ে দুটি মানুষের ভাবী মিলনেও কীভাবে বাঁধার সৃষ্টি করে থাকে তাও দেখানো হয়েছে গৌণ চরিত্রের মাধ্যমে। আবার সমাজের দয়ালু মানুষরা কীভাবে একজন কর্মজীবি মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করে দেয় আবার কখনও কখনও আমাদের মতো মানুষদের উদাসীনতার জন্য, আমাদের অতিরিক্ত খরচের কারণে সমাজের কিছু মানুষ অনাহারে থেকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকে। অথচ আমাদের ব্যস্ততাভরা জীবনে তাদের প্রতি আলোকপাত করারও সময় থাকে না। আবার মানব সমাজের অমূল্য সম্পদ ভালোবাসা বা প্রেম তারও মূল্য নির্ধারণ করে দেয় সমাজের দ্বারা সৃষ্ট কালোবাজার। এই বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার সহায়তা নিতে হয়েছে অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রগুলির। কখনও কখনও পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর একঘেয়েমি দাম্পত্য-জীবনেও গৌণ চরিত্রের ক্ষণিকের উপস্থিতির মাধ্যমে তাদের ভালোবাসার পুনরুত্থান ঘটেছে। এইভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্পে নানারকম বিসয় বৈচিত্র আনতে গিয়ে সহায়তা নিয়েছেন গৌণ চরিত্রগুলির। এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে গৌণ চরিত্রের উপস্থিতি সার্থকতা লাভ করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, চক্রান্ত, উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., দ্বাবিংশতিতম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৫৫

২. তদেব

৩. তদেব, পৃ. ১৬৩

৪. তদেব

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, আগন্তুক, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২১১

৬. তদেব, পৃ. ২১০

৭. তদেব, পৃ. ২১৫

৮. তদেব

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, সরীসৃপ, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৭৫

১০. তদেব, পৃ. ২৭৮

১১. তদেব, পৃ. ২৬১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১২. তদেব
১৩. তদেব, পৃ. ২৭১
১৪. তদেব
১৫. তদেব
১৬. তদেব, পৃ. ২৭৫
১৭. তদেব, পৃ. ২৭৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৯. তদেব, পৃ. ২৭৮
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, বিড়ম্বনা, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২৯
২১. তদেব
২২. তদেব
২৩. তদেব, পৃ. ১২৮
২৪. তদেব
২৫. তদেব
২৬. তদেব, পৃ. ১২৯
২৭. তদেব
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, হলুদ পোড়া, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৮৪
২৯. তদেব, পৃ. ৩৮৫
৩০. তদেব, পৃ. ৩৮৬
৩১. তদেব, পৃ. ৩৮৭
৩২. তদেব, পৃ. ৩৯০
৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, গল্প পরিচয়, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫০১
৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ধরাবাঁধা জীবন, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৩২
৩৫. তদেব
৩৬. তদেব
৩৭. তদেব
৩৮. তদেব, পৃ. ৩৩৩
৩৯. তদেব, পৃ. ৩৩৪
৪০. তদেব, পৃ. ৩৩৩
৪১. তদেব
৪২. তদেব
৪৩. তদেব
৪৪. তদেব
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, কালো বাজারের প্রেমের দর, উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.,

দ্বাবিংশতিতম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৩৮
৪৬. তদেব
৪৭. তদেব, পৃ. ৩৩১
৪৮. তদেব, পৃ. ৩৩৯
৪৯. তদেব
৫০. তদেব
৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ভিক্ষুক, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৩১৭
৫২. তদেব, পৃ. ৪০০
৫৩. তদেব, পৃ. ৩৯৮
৫৪. তদেব, পৃ. ৩৯৯
৫৫. তদেব
৫৬. তদেব, পৃ. ৪০০
৫৭. তদেব
৫৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, কে বাঁচায়, কে বাঁচে! গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৪৩৯
৫৯. তদেব
৬০. তদেব
৬১. তদেব
৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, স্বামী-স্ত্রী, গল্প সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১২, পৃ. ৪৯১